অধ্যায় ১১ : অন্যান্য লোকশিল্প

লোকশিল্প সমাজ এবং ব্যক্তির নানা প্রয়োজন পূরণ করে। সভ্যতা – সংস্কৃতির স্তম্ভ হল লোকশিল্প। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার সাধনার পথে অন্যতম মৌল একক লোকশিল্প। এই শিল্পবস্তু মানুষের সাধারণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন শুধু মেটায় না। লোকায়ত মানুষের অন্তরস্থিত সৌন্দর্যশক্তির প্রকাশরূপ এমন লোকশিল্প। সমাজনিষ্ঠ মানুষের রসসন্ধানী মনের পরিচয় পাওয়া যায় লোকশিল্পের মধ্যে। সংহত লোক সম্প্রদায়ের কর্মমুখর জীবনের নানা প্রয়োজন পূরণ করে লোকশিল্প। সকাল থেকে রাত্রি, নানা বৃত্তিজীবী শিল্পী সম্প্রদায়ের কর্মময় জীবনচর্যার ফলশ্রুতি লোকশিল্প। রাত্রি থেকে গ্রাম-পল্লী – পাড়া মুখর থাকত লোকশিল্পীর কর্ম ব্যস্ততায়। এমন জীবনের শিল্পকে নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে শ্রেণীকরণ করা সম্ভব নয়। বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর লোকশিল্প জীবনের কোণে কোণে প্রান্তিক আলো ফেলায়। এমন অজস্র লোকশিল্পকে বিন্যাসের আঙিনায় বিন্যস্ত করা কঠিন। এগুলিই বিবিধ লোকশিল্প, যাকে আলোচ্য আলোচনায় অন্যান্য লোকশিল্প নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কবিকঙ্কণের কাব্য যথার্থই লোকশিল্পের ভাণ্ডারঘর। প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের মিশেল ঘটেছে লোকশিল্পে। লোকশিল্পের বিচিত্র বৈচিত্র্যে ভরপুর কবিকঙ্কণের কাব্য। অন্যান্য যে সমস্ত লোকশিল্প কবির কাব্যে এসেছে, সেগুলি হল – ঘানি, চামর, চন্দ্রাতপ, কড়ি, ছাতা, ঢেঁকি, জলঝারি, বড়ি, উনুন, লাটাই, চিড়া, পানের বোরজ, পাশা, পুঁথি, পাটা, কলম, কিরীট, চড়ক ফোটা, তিলক, গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা প্রভৃতি। ঘানি হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্য লোকশিল্প। তেল নিষ্কাশনের লোক প্রযুক্তি রূপে এর তুলনা মেলা ভার। তেলি সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পীরা ঘানিতে তেল মাড়ানোর বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। কলু কাঠের ঘানিতে বলদকে চালিত করে তেল মাড়াতেন। ঢেঁকিও হারিয়ে যাওয়া বাংলার গৌরবময় লোকশিল্প। ঢেঁকিতে ধান ভানা হয়। পল্লী রমণীদের আদর্শ স্থান ঢেঁকিশালের ঢেঁকি। ঢেঁকি এবং ঢেঁকিশাল কেন্দ্রিক নানা আচার – সংস্কার এবং রীতিনীতিকে হিন্দুরা মান্যতা দিয়ে থাকেন। ঢেঁকি হিন্দুদের কাছে দেবতা স্বরূপ, তারা ঢেঁকিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। ঢেঁকির সেই দিন ফুরিয়েছে। সত্যি সত্যি একটি যুগের অবসান ঘটে গেছে। সাহিত্যের পাতা ছাড়া আর কোথাও ঢেঁকিকে বিশেষভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছাতার আবিষ্কার বৃষ্টি থেকে পরিত্রাণের জন্য। আবিষ্কারক নাম চিহ্নহীন মানুষ। সাধারণ ছাতা এবং রাজছত্রের মধ্যে তফাৎ আছে। ছাতা নানা প্রতীক সম্বলিত হয়। নিম্নে

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত বিভিন্ন অন্যান্য লোকশিল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হল –

কিরীট

কিরীট হল মুকুট – '√কৃ + ঈট' – অর্থাৎ যা রশ্মি বিকীর্ণ করে। শিরোবেষ্টন বা পাগড়িও হল কিরীট। মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা এমন মুকুট তৈরি করেন। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধারা মাথায় লৌহনির্মিত মুকুট পরেন। এছাড়া রাজা-রাজড়াদের মুকুট স্বতন্ত্র শ্রেণীর। শিবের মাথায় থাকে কিরীট। আর এমন মুকুটে শোভা পায় চন্দ্রকলা। অবশ্য শিবের কিরীট ভূষণ সর্প। কবিকঙ্কণ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন –

"বাসুকি হইল মাথে কিরীট ভূষণ
অঙ্গদ বলয়া হইল ভুজঙ্গমগণ
মুকুট উপরে শোভে সুধাকর – কলা,
ধরিল মদনরূপ মনোহর লীলা"। [১]

অবশ্য এখানে শিবের "কিরীট ভূষণ" বাসুকি। আর্য – অনার্যের মেলবন্ধন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক আরণ্যক সময় চিহ্নিত হয়েছে শিবের অলংকার সজ্জায়। শিবের এমন বিবাহ লোকসমাজে নানা অনুষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। হিমালয় তাঁর স্নেহের কন্যা গৌরীকে সম্প্রদানের সময় সাধ্য অনুযায়ী দান সামগ্রী দিয়েছেন। শিব বিবাহের সজ্জায় সজ্জিত। হীরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর "বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প" গ্রন্থে লিখেছেন – "আর একটি দিক থেকেও বৈশিষ্ট্য খুব লক্ষণীয়। সেটি হল, বাঙালি সমাজের বিয়েতে গায়ে হলুদ, জল সইতে যাওয়া, ছাঁদনা তলায় স্ত্রী আচার [. . . . .] ইত্যাদি যে লৌকিক ক্রিয়াগুলি আছে এই অনুষ্ঠানে একমাত্র সেগুলোই উপস্থিত। কিন্তু গোত্রপ্রবর ইত্যাদির নামোল্লেখে কন্যা সম্প্রদানের ক্রিয়া, বৌদিক মন্ত্রপাঠে যজ্ঞ কর্মানুষ্ঠান এসমস্ত অনুপস্থিত"। [২]

ঘানি

ঘানি বাঙালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল একসময়। সরষে তেল, নারকেল তেল, নিম তেল, করঞ্জ তেল ফলের বীজ থেকে ঘানিতে পেষাই করে বের করা হত। সেকালে ঘানি মাড়ানো সরষের তেলের ঝাঁঝ ছিল। "গ্রামীণ ঐতিহ্যের ঝলক" গ্রন্থে প্রবালকান্তি হাজরা লিখেছেন – "দীর্ঘকাল ব্যাপী গ্রামীণ জীবনে ঘানির মাধ্যমে তেল বার করার একটি দেশীয় পদ্ধতি ছিল। এ কাজ করতেন যাঁরা তাঁদের বলা হতো কলু। বংশ পরম্পরায় এই কাজটি পেশাদারি বৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ায় সমাজে এঁদের পরিচয় ছিল 'তেলি'। তেল বার করতেন বলে 'তেলি'। বৃত্তির কারণে এঁদের একটি বিশেষ পদবীও সমাজে চিহ্নিত হয়ে যায় 'সাউ' [.....] তেল বার করাটা শত শত বৎসরের গ্রামীণ ঐতিহ্যের অঙ্গ। বর্তমান কালে গ্রাম থেকে উঠে গেছে তেল বার করার ঐতিহ্যবাহী ঘানি। [....] খাঁটি সরষের তেল ছিল এই ঘানির তেল। এখনকার মত শিয়ালকাঁটা মেশানো যন্ত্রে পেষা ভেজাল তেল নয়"। [৩]

ঘানি হারিয়ে যাওয়া এক চমৎকার লোকশিল্প। ঘানিতে তেল নিষ্কাশন করা হত। প্রাচীন ভারতবর্ষের এমন মহত্তম প্রযুক্তি যন্ত্র যুগের প্রভাবে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। এককালে তেল নিষ্কাশনের জন্য ঘানিই ছিল প্রধান অবলম্বন। পশ্চিমবঙ্গে হুগলী, আরামবাগ এবং কাঁথি মহকুমায় ঘানির বহুল প্রচলন ছিল। বাংলাদেশের ঘানি জামবাটির মত বড় একখণ্ড কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত। ঘানিগাছও গাছের গুঁড়ি দিয়ে নির্মিত হত। ওড়িশায় চিৎ করে শোয়ানো দুটি কাঠের পাটায় ঘানি নির্মিত হত। বিহারে খাড়া ভাবে রাখা কাঠের পাটা দিয়ে ঘানি নির্মিত হত। বিহারে স্ত্রী পুরুষে টানা একখন্ডে তৈরি নালিযুক্ত ঘানির সন্ধান পাওয়া গেছে। এক বলদে টানা এবং দুই বলদে টানা এমন উভয় প্রকার ঘানি বিহারে প্রচলিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় এক বলদে টানা নালিযুক্ত পিঁড়ি বিশিষ্ট ঘানির প্রচলন ছিল। বলদের সাহায্যে ঘানি চালানোর সময় অনেক স্থানে বলদের চোখে ঠুলি বাঁধা হয়। অবশ্য কোথাও তা নিষিদ্ধ ছিল। তেলি সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পীরা ঘানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলু কাঠের ঘানিতে বলদকে চালিত করতেন। R. V. Russell তাঁর সুবিখ্যাত "The Tribes and castes of the Central Provinces of India" Volume 1' গ্রন্থে "Teli" প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> ""Teli – A Caste of oil pressers. Sub caste of Barhai, Dangri and Gondhali". [৪]

সেকালের এক একটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামেই ছিল তেলিপাড়া, কামারপাড়া, কুমোরপাড়া প্রভৃতি। সারা বৎসর মানুষ তাদের 'জাত' শিল্পের সাহায্যে জীবিকা র্নিবাহ করতেন। ব্রাত্য মানুষেরা ছিলেন শিল্পী। নির্মলকুমার বসু তাঁর 'ভারতের গ্রাম জীবন' গ্রন্থের 'তেল ও তেলের ঘানি' প্রবন্ধে লিখেছেন --- "সরিষা জাতীয় তৈল নিষ্কাশনের পক্ষে [....] ঘানিই ভারতের প্রধান অবলম্বন। ঘানির দুইটি প্রকারভেদ আছে।এক প্রকার ঘানিতে বীজ পেষার সঙ্গে সঙ্গে ফুটা বা জিভ দিয়া বিন্দু বিন্দু তেল ঝরিতে থাকে। অপরটিতে ফুটা নাই। [....] তেলের ঘানি আর্য-সংস্কৃতির সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সম্পৃক্ত না হইবারই কথা।' [৫]

সেকালে কলুরা কিভাবে ঘানিতে তেল নিষ্কাশন করতেন তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন R. V. Russell তাঁর "The Tribes and Castes of the Central provinces of India" Volume 1, গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন – "The Ekbeile Telis harness one bullock only to the oil – press and the Dobeile two bullocks. As it is thought sinful to use the sacred ox in this manner and to cover his eyes as the Telis do, it may be slightly more sinful to use two bullocks than one." [৬]

নগর পত্তনের সময় যখন প্রজাবসতি হয়েছিল, তখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসতি গড়েছিল কলুরা। কলু ঘানি পেড়েছিল। মুকুন্দরাম লিখেছেন----

মৎস্য বেচে চষে চাষ কৈবর্ত ধীবর দাস
কলু নগরে পিড়ে ঘানী।" [৭]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তেল কলের আবির্ভাব ঘানির অবশেষ ঘোষণা করেছে। অনেক কৃষিনির্ভর লোকশিল্পের মতো ঘানিও আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের নানা বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের শিল্পকর্ম আজ হারিয়ে গেছে। কিন্তু একসময় পল্লীগ্রামে এগুলি ছিল জীবন্ত। R. V.Russell তাঁর 'The Tribes and Castes of the Central Provinces of India' গ্রন্থে লিখেছেন--- "In Bengal certain castes, such as the Tanti or weaver of fine muslin, the Teli or oil-presser, and the kumhar or potter, rank with the ceremonially pure castes. [৮]

চিড়া

চিড়া কুটানো সম্প্রদায় একালে প্রায় লুপ্ত। মধ্যযুগের সেই পল্লি- প্রকৃতি আজ আর নেই।পল্লীতে পল্লীতে ভোর রাত্রির সেই চিড়া কুটার শব্দ আজ গেছে হারিয়ে। শালি ধানের চিড়ার উল্লেখ রয়েছে ছড়ায় ও নানা সৃষ্টিতে । ধান থেকে চিড়া তৈরি করার প্রচলন সমগ্র বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকে পাওয়া যায়। নির্মলকুমার বসু তাঁর "ভারতের গ্রামজীবন" গ্রন্থে লিখেছেন ----"ধান হইতে চিড়া করার রীতি গুজরাত, মহারাষ্ট্র উত্তরপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে আসাম পর্যন্ত এবং দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সর্বত্র প্রচলিত। তবে মুড়ি আর খইয়ের ব্যবহার সর্বত্র নাই" [৯]

হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের সময়ে শুষ্ক অন্ন অর্থাৎ চিড়ে খাওয়ার রীতির উল্লেখ আছে। "স্মৃতিচিন্তামণিঃ" গ্রন্থে শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য উল্লেখ করেছেন--- "চিপিটকাদিশুষ্কান্ন ভোজনে পক্বান্ন ভোজনার্দ্ধম"। [১০]

কবিকঙ্কণের কাব্যে চিড়া কুটা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। 'ছুতার' সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা চিড়া কুটেন। গুজরাট নগরে প্রজাবসতি হয়েছে। অন্যান্য বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছুতারেরাও এসেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন---

"ছুতার নগর মাঝে চিড়া কুটে মুড়ি ভাজে
কেহ করে চিত্র নির্মাণে"। [১১]

বণিকখণ্ডেও চিড়ার উল্লেখ আছে। 'ভারি'দের উল্লেখ করেছেন কবি। 'ভারিগণ' ভারে ভারে জিনিসপত্র জোগান দেন। লহনা দাসী দুর্বলাকে নিয়ে বাজারে চলেছেন। লহনা রন্ধন শেষ করেছেন। পরিশেষে দুর্বলা স্নান শেষে আহারে বসেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"স্নান করি দুবলা খায় খণ্ড দধিকলা
চিড়া দধি দেয় ভারিগণে"। [১২]

সেকালে ভারি দইয়ের ভাঁড় যোগান দিতেন। দুধ কলা মাখিয়ে চিড়া খাওয়া শুদ্ধ সাত্ত্বিক আচারের মধ্যে পড়ে। দাসী দুর্বলা স্নান করে আহার্য গ্রহণের এমন রীতি সংস্কার বজায় রেখেছেন। হিন্দু সংস্কারের এমন রীতি একালে আর প্রায় নেই।

চামর

চামর রাজোপকরণ। যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে চামরকে এই অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে –

"চামরশ্চাথ ভৃঙ্গারশ্চসকঞ্চ প্রসাধনী"। [১৩]

চামর, হীরক, পদ্মরাগ, বৈদূর্য, নীলমণি প্রভৃতি রত্নখচিত হয়। প্রাচীনকালে সম্রাট ছাড়া সাধারণ রাজার চামর ব্যবহারের অধিকার ছিল না। কথিত আছে, হিমালয় প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলি পর্বতে যে "চমরী" পাওয়া যায়, তাদের লোম থেকেই চামর প্রস্তুত হয়। এগুলি স্থলজ চামর। জলজ চামর সমুদ্রজাত চমরীর লোম থেকে প্রস্তুত হয়। রাজোপকরণ ছাড়াও দেবদেবীর পুজোতে চামরের ব্যবহার হয়।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চামরের ব্যবহার অনেক। "মেঘদূত" কাব্যের পূর্বমেঘের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে বারবিলাসিনীদের ক্লান্ত হস্তে রত্নখচিত দণ্ডযুক্ত চামর দোলানোর ছবি বিধৃত আছে। মহাকবি লিখেছেন –

"পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ"। [১৪]

চামরকে চমৎকার শিল্পীত রূপ দিয়েছেন লোকশিল্পীরা। চামরের সৌন্দর্য দৃষ্টি নন্দন। চামরের হাতল কাঠ বা পেতলের তৈরি হয়। হাতলকে নানাভাবে অলংকৃত করা হয়। হাতলের বন্ধনীকে সোনা রূপা হীরে প্রভৃতি অলংকারে সৌন্দর্য মণ্ডিত করা হয়। সাধারণ চামরে অবশ্য এসব অলংকরণের কাজ থাকে না। গরমে চামর বাতাসের প্রয়োজন মেটায়। চামর নির্মাণ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরাণ প্রণেতা ও শাস্ত্রকারদের অভিমতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মঙ্গল – অমঙ্গল, শুভ – অশুভ, সংস্কার এবং রীতিনীতি চামর ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেকালে বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। তালপাতার পাখা, হাতপাখার চলন ছিল। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় শিল্প চামরকে মর্যাদা দেওয়া হত। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় তাঁর – "Handicrafts of India" গ্রন্থে লিখেছেন – "Handicraft has always been a very basic activity of human society for crafts are an integral part of our life". [১৫]

কবিকঙ্কণের কাব্যে চামরের উল্লেখ এসেছে নিম্নরূপে –

১। চামর (পৃঃ ৬) ২। চামর (পৃঃ ২৮) ৩। চামর (পৃঃ ৬) ৪। চামর (পৃঃ ৪৩) ৫। চামর (পৃঃ ৪৫) ৬। চামর (পৃঃ ৮০) ৭। চামর (পৃঃ ১০৪) ৮। চামর(পৃঃ১২১) ৯। চামর (পৃঃ ১২৩) ১০। চামর (পৃঃ ১৯৬) ১১। চামর (পৃঃ ১৯৭) ১২। চামর (পৃঃ ২০৯) ১৩। চামর (পৃঃ ২০৯) ১৪। চামর (পৃঃ ২১১) ১৫। চামর (পৃঃ ২১১) ১৬। চামর (পৃঃ ২১২) ১৭। চামর (পৃঃ ২১৮) ১৮। চামর (পৃঃ ২৩১) ১৯। চামর (পৃঃ ২৩২) ২০। চামর (পৃঃ ২৩৪) ২১। চামর (পৃঃ ২৫১) ২২। শ্বেতচামর (পৃঃ ২৫১) ২৩। চামর (পৃঃ ২৫৪) ২৪। চামর (পৃঃ ২৫৬) ২৫। চামর (পৃঃ ২৫৮) ২৬। চামর (পৃঃ ২৭১) ২৭। চামর (পৃঃ ২৭১) ২৮। চামর (পৃঃ ২৭১) ২৯। ধবল চামর(পৃঃ ২৭৩) ৩০। চামর (পৃঃ ২৭৪) ৩১। ধবল চামর (পৃঃ ২৭৫) ৩২। চামর (পৃঃ ২৭৬) ৩৩। শ্বেতচামর (পৃঃ ২৯৩) ৩৪। চামর (পৃঃ ২৯৩) ৩৫। চামর (পৃঃ ২৯৩) ৩৬। চামর (পৃঃ ২৯৩) ৩৭। চামর (পৃঃ ২৯৪) ৩৮। চামর (পৃঃ ২৯৪) ৩৯। চামর (পৃঃ ২৯৫) ৪০। শ্বেতচামর (পৃঃ ৩০০) ৪১। চামর (পৃঃ ৩০৩)

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [১৬]

বিশ্বকর্মা দেবী চণ্ডীর জন্য মন্দির নির্মাণ করছেন। মন্দিরে রেখেছেন শ্বেতচামর। কবি লিখেছেন –

"ধবল চামর দিল ত্রিসক পতকা
রাকাপতি বেড়ি জেন ---- ফিরএ বলকা"। [১৭]

মধ্যযুগের বাণিজ্যে যে দ্রব্য বিনিময় হত, সেখানে চামরের বিনিময়ও লক্ষ করা গেছে। শ্রীমন্ত সিংহল দেশের সঙ্গে যে বাণিজ্য বিনিময় করেছেন, সেই বিনিময়ের উপকরণ রূপে চামরের উল্লেখও পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব গুঞ্জা বদলে পলা।
পাটসোন বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা"। [১৮]

সেকালের সেই রাজাও নেই, নেই তাদের ব্যবহৃত চামর। তবুও বাঙালি স্মৃতি ভারাতুর। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রসার এই লোকশিল্পের বিনষ্টিকে ত্বরান্বিত করেছে। এখন দেব-দেবীর পূজায় ব্যবহৃত চামর ছাড়া এমন লোকশিল্পকে বিশেষ পাওয়া যায় না। চামর একালে প্রায় হারিয়ে যাওয়া শিল্প, যা কিছু বেঁচে আছে তাতে পড়েছে আধুনিকতার ছাপ। মধ্যযুগের সেই পল্লী পরিবেশ, সেই সংস্কার বিশ্বাস, সেই বাঙালি ধর্মপ্রাণ হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুর, পূজা – পার্বণ, বার ব্রত, সামাজিক অনুষ্ঠানের

কল্যাণমূর্তি ও শুভবোধ – ঢাকের শব্দ ও মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি একালে আর মেলে না। এগুলি বিস্মৃত উপকথার মত হারিয়ে যাওয়া বিষয়। চামরকে আর একালের আলো ঝলমল রৌদ্রকরোজ্জ্বল বহুজাতিক মিশ্র সংস্কৃতির দেব পূজায় সেভাবে পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রাতপ

মধ্যযুগের এক গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প হল চন্দ্রাতপ বা চাঁদোয়া। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম এবং লৌকিক অনুষ্ঠানে চাঁদোয়ার ব্যবহার হতো। চাঁদোয়াকে চন্দ্রাতপ ছাড়া সামিয়ানাও বলা হত। শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাঁর "প্রাচীন বাংলা – কাব্যে কুটির শিল্প" প্রবন্ধে লিখেছেন –

"চাঁদোয়া – প্রাচীন বাংলায় বহুল প্রচলন ছিল"। [১৯]

চাঁদোয়া বা সামিয়ানা পাট বা চটের তৈরি। মণ্ডপ সাজানোর সময় রঙিন কাপড়, কাগজের ফুল, পাখি, নানা নকসা এবং অলংকরণের সাহায্যে কারুকার্য খচিত রূপ দেওয়া হয়। সামাজিক – সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রকমফের অনুযায়ী নানা মোটিফ সম্বলিত চিত্রকলার পরিচয় বিধৃত থাকে মণ্ডপে। আবদুল হাফিজ তাঁর "বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য" গ্রন্থে লিখেছেন –

"লোকশিল্পের সঠিক বিচার করলে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, কতকগুলি মোটিফ যেমন ত্রিভূজ, চক্র, বৃত্ত, রশ্মিবিকীরণরত সূর্য (Rayed Sun) আড়াআড়িভাবে সমন্বিত দন্ড, চক্র, সর্পিল রেখা, অর্ধবৃত্ত, পদ্ম, শঙ্খ, অর্ধচন্দ্র, রঙীন ও কালোবিন্দু প্রভৃতি যাদুবিদ্যা থেকে উদ্ভুত। [. . . .] যুগ যুগ ধরে বাংলার মা বোনেরা এসব মোটিফ ব্যবহার করেছেন। এই শিল্পকলার কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। হিন্দু বাঙালী তার লক্ষ্মীর পা, ঝাঁপি কিংবা সরায় যে বক্তব্য রাখেন বাঙালী মুসলমান জায়নমাজ ও মহরমের বিচিত্র মোটিফ সম্পন্ন পিঠেতেও সেই একই বক্তব্য রাখেন। উদ্দেশ্যও একই"। [২০]

কবিকঙ্কণের কাব্যে চন্দ্রাতপ এসেছে নিম্নলিখিতভাবে –

১। ছান্দলা (ছাঁদনা, পৃঃ ৪৩) ২। চাঁদা (সামিয়ানা, পৃঃ ১২১) ৩। চান্দা (পৃঃ ১৬১)
৪। চন্দ্রাতপ (পৃঃ ১৭৪) ৫। চন্দ্রাতপ (পৃঃ ২০৬) ৬। চন্দ্রাতপ (পৃঃ ২৫১)

[উপরিলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যপঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [২১]

যজ্ঞের মণ্ডপ চন্দ্রাতপ দিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে। সেকথা উল্লেখ করেছেন কবি –

"যজ্ঞের মণ্ডপে টানাঞি চন্দ্রাতপে
চৌখুরি পুরিয়া চন্দনে"। [২২]

একালেও সামাজিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মে মণ্ডপ সাজানো হয়। কিন্তু মধ্যযুগের সেই সমাজ – পরিবেশ একালে আর পাওয়া যাবে না। একালের প্যান্ডেল এবং সেকালের মণ্ডপের মধ্যে গভীর ভেদরেখা থেকে গেছে। সেকালের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গ্রাম্য মানুষের উপস্থিতি একালে ভিন্নভাবে ভিন্নকৌণিক মাত্রাবোধে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছে। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর "শিল্প-লিপি" গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন –

"শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রাচীন ধারার পুনরুজ্জীবন (Revivalism) বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। [. . . . .] সাহিত্য অপেক্ষাও চিত্রশিল্পে এই প্রাচীন ধারার পুনরুজ্জীবন প্রথাটা অনেক বেশী। এই পুনরুজ্জীবিত শিশুকে একটু ভাল করিয়া বিচার – বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন, আমার বিশ্বাস, সর্বত্রই দেখিতে পাইবেন, এই পুনরজ্জীবনের ভিতরেও শিল্প শুধু নতুন দেহ নয়, প্রাণও নতুন করিয়া লাভ করে"। [২৩]

জলঝারি

কবিকঙ্কণের কাব্যে জলঝারির উল্লেখ এসেছে। লহনা সপত্নী খুল্লনার প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করছেন। খুল্লনার সমস্ত অলংকার খুলে নিয়েছেন। দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন লহনা। তৃষ্ণায় ক্রন্দন করছেন খুল্লনা। অবশেষে দুর্বলা দয়াপরবশ হয়ে খুল্লনাকে জল দিচ্ছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"ধাইআ দুবলা গেল হাতে জলঝারি
সানুকম্পে দুয়া তার মুখে দেই বারি"। [২৪]

সপত্নীর অত্যাচার সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপ্ত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মমত্ববোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। জলঝারি দিয়ে ক্রন্দনরত তৃষ্ণার্ত খুল্লনাকে জল দিয়েছেন দুর্বলা। জলঝারি দিয়ে জল দেওয়ার নজির একালে আর পাওয়া যায় না। অজিত মুখার্জী তাঁর "Folk art of India" গ্রন্থে লিখেছেন –

"The folk artist who inherited the "group soul" or The sum total of artistic consciousness proceeding him functioned at his best when both his material needs and spiritual satisfaction where assured by society". [২৫]

জুতো

ব্যাসদেবের মহাভারতে চামড়ার জুতো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে "অনুশাসন পর্ব" - এ একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতকার লিখেছেন -

"যদিদং শ্রাদ্ধকৃত্যেষু দীয়তে ভরতর্ষভ !
ছত্রং চোপানহৌ চৈব কেনৈতৎ সম্প্রবর্ত্তিতম্ ।। ১ ।।

. . . .

সা গচ্ছন্ত্যন্তরা ছায়াং বৃক্ষমাশ্রিত্য ভামিনী।
তস্থৌ তস্যা হি সন্তপং শিরঃ পাদৌ তথৈব চ ।। ১১ ।।

. . . .

মহর্ষে! শিরসন্ত্রাণং ছত্রং মদ্রশ্মিবারণম্।

প্রতি গৃহ্নীষ্ব পদ্ভ্যাঞ্চ ত্রাণার্থং চর্ম্মপাদুকে"।। [২৬]

অর্থাৎ - "শ্রাদ্ধকার্য্যে এই যে ছত্র ও চর্ম্মপাদুকা দান করে; কোন ব্যক্তি ইহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ।। ১।। [. . . . .] তিনি (রেনুকা) গমন করিতে থাকিয়া পথিমধ্যে ছায়াকারী কোন বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন। কারণ সূর্যের কিরণে তাঁহার মস্তক ও চরণযুগল সন্তপ্ত হইয়াছিল ।। ১২ ।। [. . . . .] (সূর্য বলিলেন) মহর্ষি! আমার রশ্মিনিবারক ও মস্তকরক্ষক এই ছত্রটী এবং চরণরক্ষার জন্য এই চর্ম্মপাদুকা দুইখানি গ্রহণ করুন"। [২৭]

সভ্যতার আদিকাল থেকে চর্ম মানব সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে ব্যবহৃত। চর্মজাত শিল্প সামগ্রী মানুষের নানা প্রয়োজন পূরণ করেছে। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর "প্রাচীন শিল্প পরিচয়" গ্রন্থে "চর্ম" সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রাচীনকালে ভারতীয় ঋষিরা চর্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করতেন। রামায়ণে চর্মকে শয্যার আবরণ রূপে ব্যবহারের কথা মেলে। রামচন্দ্র উৎকৃষ্ট চর্মাবৃত (অজিন) শয্যায় শয়ন করতেন। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকান্ডে বলা হয়েছে –

"অজিনোত্তর সংস্তীর্ণে বরাস্তরণসঞ্চয়ে।
শয়িত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ কথং শেতে মহীতলে"।। [২৮]

প্রাচীনকাল থেকে চর্মের নানা শিল্পদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। চর্মের পাদুকা, চর্মের বিছানার শয্যা, চর্মের কবচ, চর্মের পেটিকা প্রভৃতির উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে পাদুকা বা জুতা উল্লেখযোগ্য।

গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর "প্রাচীন শিল্প পরিচয়" গ্রন্থে লিখেছেন –

> "মানব সভ্যতার ইতিহাসে জুতা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কারণ, কোন দেশ কতকাল হইতে জুতার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, তাহাই সভ্যতা-লাভের একটি বিশিষ্ট পরিচয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পের পরিচয় প্রদান করিতে হইলে, জুতাতত্ত্ব উপেক্ষা করিবার উপায় নাই"। [২৯]

চর্মকার বা মুচি সম্প্রদায়ের ব্রাত্য শিল্পীরা জুতো তৈরি করেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষকে চামারও বলা হয়। R. V. Russell তাঁর "The Tribes and Castes of The Central Provinces of India, Volume – I", গ্রন্থে লিখেছেন –

"Mochi – (A shoemaker) A caste. Subcaste of Chamar". [৩০]

R. V. Russell আরো লিখেছেন –

"These castes the Chamars, Basors, Mahars, Koris, Gandas and others are usually also employed as agricultural and casual labourers. [. . . .] like that of the sudra and that was practically equivalent to slavery. [৩১]

1880 খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত George C. M. Birdwood তাঁর "The Arts of India" গ্রন্থে চর্মশিল্প ('Leather') সম্পর্কে লিখেছেন –

"Bengal Ladies use a toilet box made of leather, and cloth, [. . . . .] It generally contains also the iron bracelet which married women always carry about with them to ensure long life to their husbands". [৩২]

একসময়ে জুতা ধনী, অভিজাত এবং সম্পন্ন গৃহস্থ মানুষেরাই ব্যবহার করতেন। সম্প্রতি পল্লীবাংলার অর্থনীতি এবং মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামের সাধারণ

মানুষ জুতা ব্যবহার করেন। নির্মলকুমার বসু তাঁর "ভারতের গ্রাম জীবন" গ্রন্থের "পাদুকা" প্রবন্ধে লিখেছেন –

> "ভারতের অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীজাতির মধ্যে জুতা পরিধানের রেওয়াজ নাই। কোথাও কোথাও ধনী উচ্চবর্ণের মধ্যে ইহার ব্যবহার আবদ্ধ আছে। [. . . . .] মধ্যপ্রদেশের বস্তার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, কেরল এবং মহারাষ্ট্রের কোবালা ও রত্নগিরি জেলা সম্পর্কে ইহা বলা চলে যে, এখানে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে জুতা ব্যবহারের রীতি নাই"। [৩৩]

তবে একালে ব্যবহৃত জুতা আর পল্লীগ্রামে মুচিরা প্রায় তৈরি করেন না। সেই মুচি বা চামার নামের "সমাজ বন্ধু" সম্প্রদায় প্রায় হারিয়ে গেছে। এখন জুতো প্রস্তুত করেন বহুজাতিক কোম্পানীর শ্রমিকরা শহরের কারখানা ঘরে। সেই পল্লী শিল্প আর বেঁচে নেই। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে জুতোর উল্লেখ এসেছে। দেবী চণ্ডী দশভূজা রূপ ধারণ করে পূজা গ্রহণ করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

> "অঙ্গদ কঙ্কণ জুতা হইল দশভূজা
> জেই রূপে অবণিমন্ডলে লৈল পূজা"। [৩৪]

সেকালের শাস্ত্রকারেরা হিন্দুদের উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এবং বিশ্বাস সংস্কারে জুতা ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। দেবীপুরাণে এরকম "গুরুপাদুকা" নির্মাণের কথা আছে। "গুরুপাদুকা" মণি, রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু এবং চন্দন দেবদারু প্রভৃতি কাঠের সাহায্যে নির্মিত হয় –

> "মণিরত্নময়ীকার্য হেমরূপ্যময়ী পিবা।
> চন্দনেনাপি কর্তব্যা পাদুকাপ্রতিমা পিবা"। [৩৫]

বাঙালি জীবন সংস্কৃতির একটা অধ্যায়ের মোটামুটি অবসান হয়েছে। মধ্যযুগের সেই চর্মকার বা মুচি সম্প্রদায় তাদের বৃত্তি পরিবর্তন করেছেন। সেই প্রান্তিক শিল্পী সমাজের শত শত বছরের গোষ্ঠী জীবন গেছে ভেঙ্গে। একালে কারখানার কলঘরে বহুজাতিক কোম্পানীতে, কম্পিউটারের বোতামে, বহু শ্রমিকের শ্রমে তৈরি হয় জুতো।

ঢেঁকি

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে ঢেঁকি ব্যবহৃত হত। বাংলাদেশে ঢেঁকির গুরুত্ব ছিল অনেক। ভারতবর্ষ এবং চীনদেশে ঢেঁকির ব্যবহার আছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে ঢেঁকির উল্লেখ নানা স্থানে পাওয়া যায়। ঢেঁকির গঠন প্রক্রিয়া জটিল। দীর্ঘ কাঠ

এবং কাঠের প্রযুক্তির সাহায্যে ঢেঁকি তৈরি করা হত। পল্লী রমণীরা ঢেঁকিশালে ‘গড়’ অর্থাৎ গর্ত খুলে পাড় দিয়ে ধান ভানে। নির্মলকুমার বসু তাঁর ‘ভারতের গ্রাম জীবন’ গ্রন্থে লিখেছেন – “ধান্যাদি কুটিবার জন্য ঢেঁকি ব্যবহৃত হয়। [......] ইহা প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব ভারতেই প্রচলিত।” [৩৬]

বাংলার লোকশিল্পের সরণীতে ঢেঁকি শুধু প্রয়োজন মেটায় না, ঢেঁকি শিল্প – কারুশিল্প। ঢেঁকি আজ নেই, একান্তই হারিয়ে যাওয়া শিল্প। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যথার্থই লিখেছেন – “কারু-শিল্পই হউক, আর চারু-শিল্পই হউক, সভ্যতার ইতিহাসের নিকট উভয়েই তুল্য সমাদর লাভ করিবার যোগ্য। যে জাতির সৌন্দর্যবোধ যে পরিমাণ বিকাশলাভ করে, সেই জাতি সেই পরিমাণে জীবনযাপনের উপকরণগুলিকেও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে – কেবল যেন তেন প্রকারেণ কার্য সাধন করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। এই কারণে পুরাতন মৃদভান্ডটি পর্যন্ত – পুরাতন মানব সভ্যতার দ্যোতক বলিয়া ইতিহাস লেখকের নিকট অশ্রদ্ধেয় হয় না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান আছে বলিয়া তাহার ভগ্নাংশ পর্যন্ত প্রাচীন শিল্প নিদর্শনের সংগ্রহালয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।” [৩৭]

কবিকঙ্কণের কাব্যে ঢেঁকির উল্লেখ আছে। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর কাছে অনেক দাবী করেছেন। কালকেতু তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন। ভাঁড়ু কালকেতুর কাছে হাল, বলদ, ঢেঁকি, কুলা পাওয়ার জন্য নিবেদন করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“হাল বলদ দিবে খুড়া   দিবেহে বিছন-পুড়া
ভান্যা খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে।”[৩৮]

ঢেঁকিকে হিন্দুরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন। নারদের বাহন ঢেঁকি। ঢেঁকির সঙ্গে হিন্দু মিথের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ঢেঁকি এবং ঢেঁকিশাল কেন্দ্রিক নানা আচার-সংস্কার-রীতিনীতিকে হিন্দুরা মান্যতা দিয়ে থাকেন। ঢেঁকি তৈরি করেন ছুতোর বা সূত্রধরেরা। অজিত মুখার্জী তাঁর ‘Folk art of India’ গ্রন্থে লিখেছেন –

“According to tradition the worker in wood is called a Sutradhar or ‘one who holds the string” [৩৯]

সূত্রধরদের কাজ ফুরিয়েছে। ঢেঁকির ব্যবহার আজ আর নেই। একান্তই একটি যুগের অবসান ঘটে গেছে। সাহিত্যের পাতা ছাড়া আর ঢেঁকির চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেকালে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানার সময় মহিলারা শুধু গল্প গুজব হাসি-

ঠাট্টা নয়, ধান ভাঙার গানও গাইতেন। পল্লী রমণীদের মুখরতা ঢেঁকিশালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

সমাজ-সংস্কৃতি-লোকাচার-সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান এবং পূজা পার্বণের সঙ্গেও ঢেঁকি বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। বাঙালি জীবনে ঢেঁকি একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। নবান্ন উৎসব, পিঠে পুলি, চাল পেটাই এসব কাজ ঢেঁকি শালেই হয়ে থাকে। ঢেঁকিতে ধান চাল ভানার কাজ একটি সমষ্টিগত প্রয়াস। এককথায়, মহিলাদের ঘরকন্নার অংশ বিশেষ হল ঢেঁকি ও ঢেঁকিশাল। ঢেঁকিকে নানাভাবে অলংকৃত করা হয়। নানা পৌরাণিক মূর্তি, মাছ, ফুল, ফল ঢেঁকিতে অঙ্কন করা হয়। তক্ষণ শিল্পের এক আশ্চর্য নিদর্শন ঢেঁকি। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের একটা যুগের অবসান ঘটে গেছে। ঢেঁকি লুপ্ত হয়ে গেছে। বাঙালির স্মৃতিতে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অতীত গল্প-কথকতা ছাড়া ঢেঁকিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বড়ি

বড়ি বাঙালি রমণীর শিল্পরুচির এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। প্রয়োজন, সামাজিক আবেদন,সৌন্দর্য এবং আচার-সংস্কারের প্রতিফলন বড়ির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বড়িকে গহনার আকৃতি সদৃশ করা হয়। এমন বড়িকে গহনা বড়ি বলা হয়। বিরি বা বিউলির ডালই বড়ি তৈরির প্রধান উপকরণ। শীতকাল বড়ি তৈরির পক্ষে আদর্শ। বড়ি তৈরির পূর্বরাত্রে কলাই ভিজিয়ে, খোসা ছাড়িয়ে, শিল নোড়ায় বেটে, ফেটিয়ে, ফুলিয়ে, কলাপাতায় বড়ি দেওয়া হয়। রমণীর হাতের মুঠো বা আঙুলের কারুকার্যই বড়ি তৈরির প্রধান প্রকৌশল। বড়ি বাংলাদেশের ব্যঞ্জনের অন্যতম উপকরণ। গহনাবড়িকে নানা অলংকারের রূপ দেওয়া হয়। হার, পাশা, বালা, মাকড়ি, দুল প্রভৃতি অলংকারের আদলে বড়িকে রূপ দেওয়া হয়। ছোট বড়ি ফুলবড়ি নামেও খ্যাত। বাঙালির দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায়, আত্মীয় বন্ধুর আতিথেয়তায় বড়ির বিশিষ্ট স্থান আছে। স্বাদে, গন্ধে, সৃষ্টির চমৎকারিত্বে, সর্বোপরি দৃষ্টি নন্দন সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে বড়ির তুলনা মেলা ভার।

বড়ি বাঙালির প্রথা, আচার এবং সমাজনিষ্ঠ রীতিনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বড়ি তৈরির সময়ে সূর্যকে আহ্বান জানানো হয়। মেঘের কালো ছায়া দূর করা হয়। নানা ছড়া প্রবাদের সাহায্যে মেঘের আনাগোনা দূর করা হয়। হলুদ জল দিয়ে সূর্য বন্দনা করে বড়ি দেওয়া হয়। ডাল কলাইকে লক্ষ্মীর অংশ স্বরূপ মনে করা হয়। বড়ি দেওয়ার সময়ে আর একটি লোকাচার বিশেষভাবে পালনীয়, তা হল ‘বুড়া-বুড়ি’র বিবাহ। লক্ষ্মীদেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এরকম একটি নারী আচার পালিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসে পুঁথি বিচার করে কুলোতে বড় দুটি বড়ি দম্পতি রাখা হয়। দুটি বড় বড়ির বড়োটি বর, অপেক্ষাকৃত

ছোটটি কনে। বিবাহের যাবতীয় উপকরণ যথা শাঁখ বাজানো, উলু দেওয়া, চন্দন, দূর্বা, ধান, তেল, সিন্দুর, গায়ে হলুদ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে বুড়ো বুড়ির বিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ঝকঝকে রোদ্দুরে বড়ি শুকিয়ে নেওয়া হয়। বড়ি তৈরির সময়ে রমণীরা নানা শুচিতা মেনে চলেন। বড়ি তৈরির প্রক্রিয়াটিকে সার্বিকভাবে একটি মঙ্গল অনুষ্ঠানের রূপ দেওয়া হয়। বড়ি একটি চমৎকার শিল্পকলা। গহনা বড়িতে নানারকম মোটিফ তৈরি করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা প্রভৃতি স্থানে একসময় বড়ি তৈরি হত। একালে তা বিরল। একালে রমণীদের সেই মাঙ্গলিক প্রথা ও আচার পালনের রেওয়াজ নেই। সংঘবদ্ধভাবে মাঙ্গলিক সামাজিক অনুষ্ঠান পালনের রীতির অবসান ঘটেছে। শহরের প্রভাব, শিল্পের প্রসার, আধুনিক শিক্ষার ব্যাপকতায় বড়ি শিল্পের একটা যুগের সমাধি ঘটিয়ে ফেলেছি আমরা।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বড়ির উল্লেখ এসেছে। আখেটিক খণ্ডে শিব ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। পল্লীতে পল্লীতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের সাধ্যমত ভিক্ষা দিয়েছেন দেবাদিদেবকে। দিয়েছেন বড়ি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“কেহ দিল চালু কড়ি কেহ দিল ডালি বড়ি
কুঁপি ভরি তৈল দিল তেলি।” [৪০]

কালকেতুর গুজরাট নগরীতে প্রজা বসতি হয়েছে। নানা সম্প্রদায়ের মানুষ বসেছেন। বসেছেন ব্রাহ্মণেরা। এমনকি ‘মূর্খ বিপ্র’ বাড়িতে বাড়িতে যজমানি করছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“কোথাহ মাসরা কড়ি কেহ দেই ডালি বড়ি
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি।” [৪১]

বণিকখন্ডে দাসী দুর্বলা সেকালের হাটে রন্ধন সামগ্রী কেনেন। কিনেছেন ফুলবড়ি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“মুগ মাষ বরবটী কিনিল সরল পুঠি
সের জুখ্যা লয় ফুলবড়ি।” [৪২]

রন্ধন পারদর্শী খুল্লনা ধনপতির জন্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত করছেন ফুলবড়ি দিয়ে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন -

“ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি নট্যা সাকে ফুলবড়ি
চিঙ্গড়ি কাঁঠালবিচি দিআ
ঘৃতে নলিতার সাক কটু তৈলে বাথুয়া পাক

খণ্ডে পেলে ফুলবড়ি ভাজিয়া।” [৪৩]

পিতৃ তর্পণে, ব্রাহ্মণ বিদায়ে ডালবড়ি উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়া হয়। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“আলু চালু ডালি বড়ি শতেক তঙ্কার কড়ি
চিড়া কলা দধি গুয়া পান।” [৪৪]

ধনপতির আদেশে খুল্লনা পুনরায় রন্ধন করছেন। শাক ফুলবড়ির ব্যঞ্জন এবং রুইমাছ ও কুমড়াবড়ির ঝোল রান্না করছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“সাক সুপ রান্ধিআ ওলায় ফুলবড়ি
ঘৃত দিয়া ভাজিল উত্তম পলাকড়ি
কটু তৈলে ভাজে রামা চিথলের কোল
রহিত কুমড়াবড়ি আলু দিআ ঝোল।”[৪৫]

সেই পৌষের শীতে ডাল ভিজিয়ে বড়ি তৈরির ধূম আর নেই। এখনও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বড়ি তৈরি হয়। কিন্তু কলাইয়ের খসা মেসিনে ছাড়িয়ে ডাল ভাঙার রেওয়াজ তৈরি হয়েছে। গ্রাম বাংলার মায়েরা বড়ি তৈরি করেন অতিথি এবং আত্মীয়দের পরিচর্যার জন্য। সহিষ্ণু, বাংলার ব্রতিনীরা, জননীরা এমন বড়ি তৈরি করেন। আত্মীয় স্বজন, পাড়া পড়শী এবং জামাতাকে আপ্যায়নের জন্য বড়ি সংরক্ষণ করেন বাঙালি রমণীরা। বড়ি তৈরির সে পরিবেশ আজ আর নেই। শুধু রন্ধন সামগ্রী রূপে নয়, বড়ি এক শিল্পিত রূপকর্ম। বড়ির শিল্প সৌন্দর্যও চমৎকার। এক হারিয়ে যাওয়া যুগের স্মৃতিচারণ করা ছাড়া একালের বাঙালির হাতে আর তেমন কিছু নেই। সেকালে ঢেঁকিশালে শুভ দিনে গ্রামবধূরা অনুষ্ঠান করতেন। সব কিছুর মধ্যে শুচিতা এবং সৌন্দর্যের ছাপ। ঢেঁকিশালেই হত বড়ি তৈরির অনুষ্ঠান। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘নিমন্ত্রণসভা’ প্রবন্ধে লিখেছেন –

“পানাপুকুরপাড়ে চিতার বেড়া ঘেরা আম্রকুঞ্জবনমধ্য হইতে বউ কথা-কও থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠে এবং পল্লীগ্রামের ঝাঁঝা মধ্যাহ্ন যেন নিঃশব্দে সেই কাসন্দীর ঝালের মধ্যে তাপ সঞ্চার করে। এমনি, কাসন্দির পর কুলচূর, কুলচূরের পর বড়ি, কুমড়া কোটা, ডাল কোটা, সরুচুকলি ও পিঠার সময় চাল কোটা, ধান ভানা, এক ঢেঁকিশালেই কত অনুষ্ঠান।” [৪৬]

লাটাই,নাটাই,নাটা

লাটাই বা নাটাই হল সুতা গুটাবার চরকি। সংস্কৃত নর্তকী > প্রাকৃত নট্টঈ > লট্টাঈ। নর্তকী সাদৃশ্যে লাটাই শব্দটি এসেছে। সেকালে বিবাহের মত মঙ্গল উৎসবে সুতা এবং নাটাই মঙ্গল দ্রব্য রূপে বিবেচিত হত। এমন কি কন্যাদানের সময়ে যৌতুকরূপেও লাটাই দেওয়া হত। ফাল্গুন মাসে খুল্লনার বিবাহ উৎসব। গন্ধ অধিবাসে ঘটক চলেছেন মঙ্গলদ্রব্য নিয়ে। নিয়েছেন সুতা ও নাটাই। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“সর্ষব পুটলি ভরা বান্ধ্যা নিল কোল সরা
সুতা নিল নাটাই সহিত।” [৪৭]

বিবাহের পরে খুল্লনার মাতা রম্ভা স্ত্রী আচার পালন করছেন। বরের চরণে দধি ঢালছেন। খুল্লনার পরিধেয় বসনে সুতো বেঁধে রাখছেন। আর সুতা লাটাইয়ের সঙ্গে সাত ফের দিয়ে নিগূঢ় বন্ধনে কন্যা জামাতাকে বেষ্টন করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“আনিল আইবড়ার সুতা লাটাই সহিত
সাতফের ফেরা দিআ করিল বেষ্টিত।” [৪৮]

ডোম সম্প্রদায়ের শিল্পীরা নাটা তৈরি করেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সে উল্লেখও এসেছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“ডোম গড়ে ছাতা নাটা।” [৪৯]

সেকালে কন্যাদানে কন্যার পিতা কন্যার বিবাহে যৌতুক স্বরূপ চরকা চরকি এবং নাটাই দান করতেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংগৃহীত কন্যাদান বিষয়ক একটি ছড়ায় উল্লিখিত আছে –

“চরকা দিলাম চরকি দিলাম নাটাই দিলাম দানে
তবু মেয়ে ঘুনঘুনাচ্ছে চক্কোবর্ত্তীর কানে –
বাবা, বাঁক দিলে না ক্যানে।” [৫০]

মধ্যযুগে চরকা-নাটাই ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতীক। জীবন – জীবিকা অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে সম্ভব ছিল না। মুকুন্দরামের কাব্যে নাটাইয়ের উল্লেখ একটা সময় কালের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলকে ফুটিয়ে তোলে।

চড়ক ফোঁটা, গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা; চুনের ফোঁটা

বাংলাদেশ লোকধর্মের দেশ। নানা সংস্কার-বিশ্বাস-রীতি-নীতি-আচার-প্রথা এবং দেববাদ এখানে ঐতিহ্যসূত্রে বহুকাল বিধৃত। পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, পিতৃ-তর্পণ, পূর্বপুরুষের জন্য তর্পণ, গঙ্গাস্নান এদেশের লোকজীবনের অস্থিমজ্জায়। পুণ্যতোয়া গঙ্গা

ভারতীয় জীবনবোধকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে। কবিকঙ্কণের কাব্যের নানা স্থানে ফোঁটার উল্লেখ আছে। দেবী দুর্গার কাঁচলিতে চিত্রাঙ্কন প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"ডানী দিগে বিশ্বকর্ম লিখে মুনিগণ
কপালে চড়ক ফোটা লোহিত বরণ।"[৫১]

ধূর্ত ভাঁড়ু দত্ত তিলক কেটেছে, পাঁজি হাতে নিয়েছে এবং কানে গুঁজেছে কলম এবং চুল রঞ্জিত করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"পাগখানি বান্ধে ভাণ্ডু নামি ঢাকে কেশ।
কেসরিআর তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ।" [৫২]

ধার্মিক হিন্দুরা গঙ্গাস্নান করে তর্পণ করেন। দেবকুল, পিতৃকুল এবং ঋষিকুল সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্নান সমাপনে কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা নেন। শ্রীমন্ত তর্পণ করে এমন গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা নিয়েছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"স্নান করি পরে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা
যব তিল কুশ কইল আনিল তুলসী
তর্পণে সন্তোষ কৈল দেব পিতৃ – ঋষি।" [৫৩]

কপালে ফোঁটা নিয়ে শুভকাজে যাওয়া দক্ষিণ ভারতের মানুষের রীতি। যুদ্ধের মুহূর্তে এমন রীতির উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ –

"রণসিংহ রণভীম ধায় রণসাটা
তিনভাই তির বেন্ধে দিআ চুনের ফোঁটা।" [৫৪]

ধর্মজাগ্রত ভারতবর্ষ। নানা প্রথা-সংস্কার বিশ্বাস, লোক-লৌকিকতা বাংলার লোকধর্ম এবং লোকসমাজকে সচল রেখেছে। হিন্দু আচার ও রীতিনীতি, হিন্দুপুরাণ, পৌত্তলিকতা মিশে আছে বাঙালির দৈনন্দিন জীবন ও কর্মে। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'স্মৃতি চিন্তামণি:' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, গঙ্গাতীরে কোন পাপ করলে, তা গঙ্গা স্নানে নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ধারণ করেন, সূর্য দর্শন করলে যেমন পাপ নাশ হয়, সেরূপ তাকে দর্শন করলে পাপ নাশ হয় –

"গঙ্গাতীরে কৃতং পাপং গঙ্গাস্নানাৎ প্রণশ্যতি।
জাহ্নবীতীরসম্ভূতাং মৃদং মূর্দ্ধা বিভর্ত্তি যঃ।
বিভর্ত্তি রূপং সোহর্কস্য তমোনাশায় কেবলম।" [৫৫]

এমনি নানা বিচিত্র লোকশিল্পে ভরপুর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লোকশিল্প সৃষ্টির আতুড়ঘর। জাতি – বৃত্তি – সম্প্রদায়, শিল্পী

ও শিল্পের বিচরণ ভূমি। দেশ – কাল – ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব – সাহিত্য – পুরাণ, চিত্রকলা, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও অর্থনীতির গবেষণাগার কবির কাব্য। সর্বোপরি প্রয়োজন ও সৌন্দর্যের চিরন্তন লীলাভূমি। মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে এক বৃহত্তর কর্মমুখর জীবন প্রবাহ যে পুঞ্জীভূত শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কবিকঙ্কণ তাকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের (অভয়ামঙ্গল) পাতায় পাতায়। এমন লোকশিল্প যথার্থই জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করে। Yuri Borev তাঁর 'Aesthetics' গ্রন্থে লিখেছেন -------"The national character of art has found and continues to find its most direct and complete expression in primitive society when art was at the mythological stage, and later in folklore : it describes the people from the point of view of the people, and is created by the people for the people'. [৫৬]

তথ্যসূত্র

১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, পৃঃ ২১

২. মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ, বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, শ্রাবণ – ১৪২৩, পৃঃ ৫

৩. হাজরা, প্রবালকান্তি, গ্রামীণ ঐতিহ্যের ঝলক, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, আগস্ট – ১৪০৯, পৃঃ ১৭৮

৪. Russell, R. V, The Tribes and Castes of the Central Provinces of India, Vol. – I, CPSIA information can be obtained at www.ic.Gtesting.com printed in the USA BVHWOIS & 0830231018, 530990BV0005BI4IP. P. CCCLXXI

৫. বসু, নির্মলকুমার, তেল ও তেলের ঘানি (প্রবন্ধ), ভারতের গ্রামজীবন (গ্রন্থ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, জানুয়ারী – ২০১৭, পৃঃ ৫৫ – ৫৭

৬. Russell, R. V., The Tribes and Castes of the Central Provinces of India, Vol. – I, CPSIA information can be obtained at www.ic.Gtesting.com printed in the USA BVHWOIS 0830231018, 530990BV0005BI4IP, P. xlix

৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, পৃঃ ৮২

৮. Russell, R. V., The Tribes and Castes of the Central Provinces of India, Vol. – I, CPSIA information can be obtained at www.ic.Gtesting.com printed in the USA BVHWOIS 0830231018, 530990BV0005BI4IP, P. xxviii

৯. বসু, নির্মলকুমার, ভারতের গ্রামজীবন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, জানুয়ারী – ২০১৭, পৃঃ ৩৭

১০. সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীহরিদাস, স্মৃতিচিন্তামণি:, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৫৫

১১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, পৃঃ ৮

১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৮

১৩. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, ভূমিকা – অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মাগান্ধি রোড, কলকাতা – ৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫, পৃঃ ১২৩ – গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

১৪. কালিদাস, মেঘদূত, সম্পাদক – রাজশেখর বসু, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ – ১৪১১, পৃঃ ৩২

১৫. Chattopadhyay, Kamaladev, Handicrafts of India, Indian Council for Culture Relations, First Published – 1975, Azad Bhavan, New Delhi, P. 1

১৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি

১৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮

১৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৬

১৯. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যকিঙ্কর, প্রাচীন বাংলা কাব্যে কুটির শিল্প, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃঃ ৩৫০, সম্পাদক – কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

২০. হাফিজ, আবদুল, বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর – ১৯৭৫, পৃঃ ১৮

২১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি

২২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪

২৩. দাশগুপ্ত, ড. শ্রীশশিভূষণ, শিলালিপি, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং. প্রা. লিমিটেড, কলকাতা, আষাঢ় – ১৩৬৮, পৃঃ ১৫৭

২৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, পৃঃ ১৩৮

২৫. Mookerjee, Ajit, Folk art of India, India Library, Clarion Books, C – 36, Connaught Place, New Delhi, 1986, Introduction, P. 15

২৬. ব্যাসদেব, শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মহাভারতম্, অনুশাসনপর্ব্ব (৩৯ খন্ড)

সম্পাদক – হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী সংস্করণ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ কলকাতা, পৃ ১১১৭, ১১১৯, ১১২৫

২৭. পূর্বোক্ত

২৮. বাল্মীকি, শ্রীমন্মহর্ষি, রামায়ণম্, অযোধ্যাকান্ড, ৮৮। ৪।।, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে – ২০১২, পৃঃ ৩৩৯

২৯. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্পপরিচয়, ভূমিকা – অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪২

৩০. Russell, R. V., The Tribes and Castes of the central Provinces of India, Vol. – I, CPSIA information can be obtained at www.ic.Gtesting.com printed in the USA, BVHWOIS, 0830231018, 530990BV0005B4IP. P. cccxxv

৩১. পূর্বোক্ত, পৃঃ xIiii

৩২. Birdwood, George CM, The Arts of India, C.S.I.M.D. Edin, British Book Company, 3rd Edition, 1986, Jerssey, CI, UK, PP. 230, 231.

৩৩. বসু, নির্মলকুমার, পাদুকা (প্রবন্ধ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, জানুয়ারী – ২০১৭, পৃঃ ৬২

৩৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, পৃঃ ৬৪

৩৫. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পাদিত), দেবীপুরাণ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, বঙ্গাব্দ - ১৪১২

৩৬. বসু, নির্মলকুমার, ভারতের গ্রামজীবন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, জানুয়ারী - ২০১৭, পৃঃ ৪৩

৩৭. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্পপরিচয়, ভূমিকা – অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ – ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ – ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬

৩৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, পৃঃ ৭৭

৩৯. Mookerjee, Ajit, Folk art of India, India Library, Clarion Books, C – 36, Connaught Place, New Delhi, 1986, Introduction, P. 15

৪০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, পৃঃ ২৬

৪১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯

৪২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৮

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯০

৪৬. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, নিমন্ত্রণ সভা (প্রবন্ধ), বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক – ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২২, পৃঃ ৪৩২

৪৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, পৃঃ ১২১

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩

৫০. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড, ছড়া), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, পৃঃ ৩৫১

৫১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, পৃঃ ৫৭

৫২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৫

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৯

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭২

৫৫. ভট্টাচার্য, সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীহরিদাস, স্মৃতিচিন্তামণি :, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৫, পৃঃ ১৮৮

৫৬. Borev, Yuri, Aesthetics, Progress Publishers, Moscow, 1985, P. 107